মুহূর্তের মহাসঙ্গ: শঙ্খ ঘোষ

১

কলেজ স্ট্রিটে পাতিরামের স্টলে সকালবেলা তখনও কোনও ক্রেতা বা কৌতূহলী পত্রিকা-সন্ধানী আসেনি, শুধু একা শঙ্খ ঘোষ খোলা কলম হাতে ঝুঁকে একটা পত্রিকার একটাই পাতায় একটা শব্দ সংশোধন করে দিচ্ছেন।

খুব কাছে গিয়ে দেখি আষাঢ়ের 'কবিতা-পরিচয়'-এ তাঁর একটি চিঠির 'সঠিক' শব্দটির 'স' কেটে দিচ্ছেন। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ়, ইংরেজি ১৯৬৬র জুনে প্রকাশিত সেটা ছিল কবিতা-পরিচয়ের তৃতীয় সংকলন।

আগের দিনই জেনেছেন যে সেদিনই পাতিরামের স্টলে পত্রিকাটা দেওয়া হবে।

'সঠিক' কি তবে ভুল শব্দ? সব ক্ষেত্রেই 'ঠিক'ই লিখতে হবে শুধু?

না, তা কেন হবে, তবে আমার এই বাক্যে 'সঠিক' ভুল, 'ঠিক' হওয়াই সংগত। ভুলটা ছাপার নয়, লেখারই।

কী ছিল সেই বাক্যটি?

'এই আতিথেয়তার ঔদার্য যে বাংলা কবিতায় ক্রমেই বাড়ছে, তা সঠিক, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছিল আমাদেরও বছর দশেক আগে থেকে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে।'

স্টলে পাঁজা করা পত্রিকার ওই সংকলনের প্রত্যেকটা কপিতে এক দাগে 'স' কাটলেন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে।

'কবিতা-পরিচয়'-এর ১৩৭৩-এর জ্যৈষ্ঠ সংকলনে সিদ্ধেশ্বর সেনের একটি কবিতা বিষয়ে অরুণ সেনের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন তিনি।

সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার ছন্দস্পন্দ বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের দীর্ঘ সেই চিঠির শেষে ছোট্ট একটি দ্বিতীয় অংশও ছিল। এইরকম: ''ঐ সংকলনের অন্য একটি আলোচনায় 'পয়ারের উদার আতিথেয়তা'র উল্লেখ করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এই আতিথেয়তার ঔদার্য যে বাংলা কবিতায় ক্রমেই বাড়ছে তা সঠিক, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছিল আমাদেরও বছর দশেক আগে থেকে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য তার পর এই পঁচিশ বছরে ছন্দ আরো অনেকটা বেশি নিতে পারছে, তাতে সন্দেহ নেই।''

বিনীত
শঙ্খ ঘোষ

জ্যৈষ্ঠ সংকলনের যে অন্য একটি আলোচনা প্রসঙ্গে ছোট্ট এই দ্বিতীয় অংশ, সেটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশদ একটি লেখা। শঙ্খ ঘোষেরই একটি কবিতা নিয়ে।

কবিতার নাম 'সুন্দর'। ক'দিন আগেই পাতিরামের স্টলে দাঁড়িয়ে জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা' পত্রিকায় সদ্য প্রকাশিত কবিতাটি পড়েই সেটি নিয়ে আলোচনার জন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর তখনকার দমদমের যুগীপাড়া লেনের ঠিকানায় চিঠি লিখি।

সুনীলদার সেই লেখাটি নিয়ে শঙ্খ ঘোষের চিঠিতে মাত্রই ওই ছ'লাইন। অথচ তাঁর মূল চিঠিটা দীর্ঘ। কেননা সেটা তাঁর নিজের কবিতা নিয়ে নয়, কিছু-বা আত্মভোলা, নিজের কবিতা বিষয়ে চিরউদাসীন সিদ্ধেশ্বর সেনের একটি কবিতার ওপর অরুণ সেনের আলোচনা প্রসঙ্গে। মূলত সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় ছন্দস্পন্দ, তাঁর 'গদ্যপদ্যের মধ্যে ভাঙা কোনো এক গুপ্তছন্দ' নির্মাণের ওপর আলো ফেলার বিশদ সূত্র বর্ণনার শেষে শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সবিস্তার আলোচনার মৃদু ও আবছায়া উল্লেখ ছিল তাঁর চিঠির দ্বিতীয় অংশটিতে।

২

বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিতার ক্লাসে আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। কবিতার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে বালকের হাতে ধরা পড়া জ্যান্ত ফড়িংয়ের প্রাণস্পন্দন কোথায় এই সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্শন-সন্ধানোন্মুখ কবিতা-ব্যাখ্যায়? পালিয়ে এসে বাংলা কবিতার অন্যরকম পাঠ ভাবতে থাকি। অথবা হয়তো আগে থেকেই তা আমার মনে দানা বাঁধছিল। পত্রিকার সম্ভাব্য আলোচকদের খুঁজে খুঁজে কবিতা পড়ার নতুন রীতির ব্যাখ্যায় মেতে উঠি। তাতে ঝালাপালা কবি-সমালোচকদের অনেকের কাছেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পলাতক ছাত্রের পরিচয় দাঁড়ালো— কবিতা-পাঠের পাদ্রী।

শঙ্খ ঘোষের কাছে যখনই গেছি, মন দিয়ে লেখার অনুরোধ শুনতেন, তাঁর প্রায় নিরুত্তরতায় মৃদু সমর্থনও যেন পেয়েছি।

পত্রিকার প্রস্তুতি যখন একেবারে শেষ পর্যায়ের, তখন একদিন বিকেলে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর বিপরীতের রাস্তায় তাঁর বাড়িতে লেখার প্রতিশ্রুতি আদায় করে উঠে আসছি, চোখে পড়ল হাতে শিশিরবিন্দুর মতো একটা ফোঁটা। ভালো করে দেখে বললাম, আমার বোধহয় পক্স হচ্ছে, হলে পত্রিকা বেরতে একটু দেরি হবে।

'আমি কী করে জানব যে আপনি সুস্থ আছেন?'

'যদি পরশু না আসি, তাহলে ধরে নেবেন বসন্ত আমাকে ছাড়েনি।'

সেবার বসন্তে দিনরাত মশারির মধ্যে বন্দী দু'বেলা মায়ের হাতে আলুসেদ্ধ মাখন-ভাত খাওয়া আর সারাদিন সরকারি রবীন্দ্র রচনাবলি বারো বা তেরো খণ্ড টানা পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল।

৩

কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় চৈত্রের বাতাসে শিমুলতুলোর মতো ভাসতে ভাসতে প্রহর থেকে প্রহরে ছড়িয়ে গিয়েছি। একবার তাঁর শ্যামবাজারের ফ্ল্যাটে রাতে কথা বলতে বলতে গরম খিচুড়ি ভোগ শেষ করে কথা যখন শেষ হল তখন সকাল হয়ে গেছে, দুজনেরই খিচুড়ি-খাওয়া হাত শুকিয়ে খরখরে।

আরেকদিন। সেদিন অবশ্য রাত বারোটা বাজার একটু আগে কুড়ি-পঁচিশ

মিনিটের বিরতিতে আমাকে একবার উঠে যেতে হয়েছিল— ঠিক রাত বারোটায় শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে 'কবিতা-পরিচয়'-এর জন্য তাঁর লেখাটা দেবেন।

কথামতো মধ্যরাতে কলকাতা শাসন করা চার যুবকের সুনিশ্চিত দর্শনস্থান শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে গিয়ে দেখি সুনীলদা ফুটপাতের রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। আমি ঠিক সময়মতোই এসেছি, অথচ তিনি কথামতো লেখাটা দিতে পারলেন না, সেই অপরাধবোধের গভীর আন্তরিকতা সেদিন আমাকে খুবই স্পর্শ করেছিল। আমি যে আজকের রাতটা কাছেই শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে আছি, সুনীলদা জানতেন না। আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে তাঁরই নতুন কবিতা নিয়ে লিখছেন, শঙ্খবাবুকে তাঁর রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একেবারেই জানাইনি। যাই হোক, লেখাটা এখনও হয়নি, কাল অবশ্যই দেবেন, তবে আমাকে আর এত কষ্ট করে এত দূরে আসতে হবে না, কাল কলেজ স্ট্রিট কফিহাউসে লেখাটা অবশ্যই নিয়ে আসবেন— এইসব শুনে আমি শঙ্খ ঘোষের কাছে ফিরে এসে আবার পুরনো প্রসঙ্গের খেই ধরি।

আরেক দিন। এক রাতের ঘটনা। বহু বছর আগে রাত্রি সাড়ে নটা বা দশটা বাজে— এসপ্ল্যানেড ট্রাম গুমটির কাছে (এখনও আছে কিনা জানি না) দেখতে পেলাম একলা একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন, গুমটি ঘেঁষা পত্রিকাস্টলে পত্রিকা পড়ছেন বা হয়তো দেখছেন। অত রাতে, হয়তো বাড়ি ফেরার ট্রামের অপেক্ষায় সময় কাটাচ্ছেন। কাছে গিয়ে দেখলাম শঙ্খ ঘোষ। ওঁকে এভাবে হঠাৎ সামনে পেয়ে আমি আর আমার উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারলাম না। ঠিক তার ক'দিন আগেই একটা পত্রিকায় পড়েছি তাঁর অসামান্য এই কবিতা—

'আমার মেয়েকে নিয়ে বুকজলে
যাবার সময়ে আজ বলে যাব:
এতো দম্ভ করো না পৃথিবী
রয়ে গেল ঘরের কাঠামো।

ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌সা করে চোখ
হাহাকার উঠেছে, তা হোক
রয়ে গেল মাটির প্রতিভা
ফিরে এসে ঠিক বুঝে নেব।'

—কবিতাটা আমার ভালো লাগার কথা ওঁকে বলায় ওঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া— 'আপনি বললেন, ভালো হল। আমার মনে একটা অস্থিরতা চলছে— মনে হচ্ছিল হয়তো লেখাটার কোথাও কোনও গোলমাল হয়ে রয়েছে।'

এরকম একটা কবিতা, যার একটি-দুটি শব্দ কিংবা প্রতিটা লাইন মানুষের মৌলিক সুখ দুঃখ ক্ষয় ক্ষতি শপথ সংকল্প নিয়ে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে, সেটা নিয়েও স্বয়ং কবিরই সংশয়! বহুদিন আগের ঘটনা এটা, তখন শঙ্খ ঘোষের এত কবিতার বই বেরোয়নি। আমার মতন একজন তুচ্ছ মানুষের কথা উনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন

এবং অকপটে স্বীকার করলেন— এতে ওঁর উপকার হয়েছে। গ্রামের অখ্যাত পত্রিকা হোক বা শহরের কোনও বিখ্যাত পত্রিকা— সব লেখাই সমান গুরুত্ব দিয়ে লেখেন। উনি লিখছেন ওঁরই লেখা। প্রসঙ্গত বলি, ১৯৬৮ সালের বন্যায় আমাদের 'সারস্বত প্রকাশ' পত্রিকার জন্য তিনি 'জলস্রোত কবিতাগুচ্ছ' লিখেছিলেন আমার আমন্ত্রণে।

'বাবরের প্রার্থনা' সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাবার পরদিনই খবরের কাগজের একটা ছোট্ট লেখায় আমি লিখেছিলাম, শঙ্খ ঘোষ শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেন নেন না, বুক ভরে নেন তাঁর সমাজ ও তার সময়কে।

পরদিন দেখা হতে শুধু বললেন, 'ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের কয়েকজন অধ্যাপকের আপনার লেখাটা ভালো লেগেছে।' তখনও তিনি যাদবপুরে অধ্যাপনা করেন। তাঁর ক্লাস শুনতে বাইরের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ভিড় করেন।

শঙ্খ ঘোষের একটা অন্তঃশীল অভিভাবকত্বের কথা বলি। একদিন আমায় বললেন, আপনি তো অনেক শহরে ঘুরছেন— বাংলার গ্রামে গেছেন? ওঁর কথার মধ্যে একটি ইঙ্গিত ছিল, হয়তো তারই রেশ ধরে আমি অনেক গ্রামে গিয়েছি। শুধু বাংলা বা ভারতেই না, ভারতের বাইরেও জর্জিয়া, মঙ্গোলিয়া, আমাজন, চিন, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বুঝেছি গ্রাম না দেখলে দেশই দেখা হয় না। আমার মনে হয়তো এই তৃষ্ণার অঙ্কুর জাগিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ ওই একটি সামান্য কথায়।

১৯৬৭র কোনও এক বিকেলে শ্যামবাজারের বাসায় বরাবরের মতো একাই গিয়েছি, ভিতর-বারান্দায় মুখোমুখি বসে দুয়েক কথার মধ্যে হঠাৎ বললেন, 'আমেরিকায় যাওয়াটা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হয়ে গেল, কিছুই লেখা হল না এখনও।'

সে বছর আমেরিকার আইওয়ায় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে পল এঙ্গেল-এর আমন্ত্রণে তাঁর দীর্ঘ বিদেশ যাত্রার কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁর এই খেদ! আইওয়া থেকে লেখা একটি চিঠিতেও তাঁর এই দীর্ঘ দূরপ্রবাসের নিষ্ফলতার আক্ষেপ দেখেছি চিঠির একাংশে।

'এখন মনে হচ্ছে আপনাদের কথাই ঠিক, এখানে আসবার হয়তো কোনোই মানে ছিল না আমার। প্রথম কিছুদিন নানা দেশের সমবেত তরুণ লেখকদের সঙ্গে কথা বলতে ভালোই লাগছিল, কোনো কোনো দেশের লেখাপত্র বিষয়ে যে আমরা একেবারেই অবহিত নই সেটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু যে-অভিজ্ঞতাটা সবচেয়ে বেশি করে হচ্ছে তা হলো নিজের বিষয়ে জানা। আমার যে আর প্রায় কিছুই লেখা হবে না এ-রকম একটা প্রত্যয় বেশ গড়ে উঠছে। কেননা এতোটা ফাঁকা সময়কে কোন্ কাজে লাগাতে পারছি? কলকাতায় থাকতে একটা ছলা তৈরি করা যেত, সময়ের অভাব। সময়ের অত্যন্ত সঞ্চয়টাও যে সবার পক্ষে সুখকর নয় তা ক্রমে ধরা পড়ছে।'

তখনও 'নিহিত পাতাল ছায়া'র পর আর কিছু লেখেননি তিনি। না লিখতে পারার সেই আক্ষেপের তিন-চার দশকের মধ্যে লেখা হয়ে গেল তাঁর একটার পর একটা

ছাইচাপা আগুন ও ভালোবাসার আভা ও বেদনা ভরা কবিতাগ্রন্থ: 'বাবরের প্রার্থনা', 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ', 'হৃৎকমলে ধূম লেগেছে', 'জলই পাষাণ হয়ে আছে', 'তুমি তো তেমন গৌরী নও', 'লাইনেই ছিলাম বাবা', 'মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়', 'হাসিখুশি মুখে সর্বনাশ', 'প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে', আর এই ২০১৪য় 'বহুস্বর স্তব্ধ পড়ে আছে'।

তার পরও, এই সেদিন, ২০১৭-র ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় নানা বিষয়ে ছড়ানো দীর্ঘ কথালাপের এক ফাঁকে বললেন, 'আমরা যখন সদ্য যুবক, তখন আনন্দবাজার, যুগান্তরের পুজোসংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ কবির কবিতা পড়ে ভাবতাম, এসব কেউ লেখেনই বা কেন, ছাপেনই বা কেন কেউ? এখন ওইসব পুজোসংখ্যায় আমার কবিতা পড়ে আপনারাও নিশ্চয় একই কথা ভাবেন!'

এর পরের বছর, এই ডিসেম্বরেই কথায় কথায় এসে গেল ভারি মজার একটা প্রসঙ্গ। বরিশালের আমড়া। ২০১৮-র অক্টোবরে জীবনে প্রথম গিয়েছিলাম বরিশাল। ঢাকার দুর্গা পুজোর কিছুটা ছবি তুলে বরিশালের কীর্ত্তনখোলা নদীতে বিসর্জনের ছবি নেওয়ার ইচ্ছে। আমার জন্ম দেশভাগের আগেই এদেশে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে হলেও জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে আসছি, আমাদের বাপ-পিতামহর দেশ ছিল বরিশালে। দেশের বাড়ি বরিশালের খলিসাকোটায়।

নবমী-দশমী বরিশাল শহরে পুজোর ছবি তোলার ফাঁকে গেলাম খলিসাকোটায়। সেখানে খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছলাম আমাদের গ্রাম বানরিপাড়া।

মাস দুয়েক পর, এই ২০১৮-র ডিসেম্বরে শঙ্খবাবু আমার প্রথম পৈতৃক গ্রাম দেখার কাহিনি শুনতে শুনতে বলে উঠলেন, একটা আবিষ্কার হল আজ। কী আবিষ্কার? ওঁদের মতো আমাদেরও দেশ বরিশালের খলিসাকোটায় বানরিপাড়া। সবটাই জানা ছিল আমার। কিছুদিন আগেই তো শারদীয় ভ্রমণ-এ লিখেছিলেন তাঁর অনবদ্য অন্তরের আলোয় স্নিগ্ধ ভাষায় তাঁর দেশ ছেড়ে আসার সত্তর বছর পরে তাঁর সেই সবুজ গ্রামের শৈশব স্মৃতিময় পৈতৃক বাড়ি ফিরে দেখা। আমার মুখে আজও সেই সবুজে গাঁথা বানরিপাড়ার কথা শুনতে শুনতে বললেন, আর সে সবুজ অন্যরকম সবুজ।

বাংলাদেশের জাতীয় ফল আমড়া কি না জানি না। ঢাকার পার্কে, রাস্তায় বড় বড় আমড়া প্রায় পদ্মের আকারে কেটে ঢালাও বিক্রি হতে দেখেছি, নানা বয়েসের নারীপুরুষ সেগুলি কিনছে ও রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছে। বরিশালেও রাস্তায়-ঘাটে আমড়ার অঢেল পসরা দেখে লোকেদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, বরিশালের আমড়াই নাকি বাংলাদেশের সেরা আমড়া।

কথায় কথায় শঙ্খবাবুকে জিজ্ঞেস করি, 'বরিশাল শহরের আমড়া খেয়েছেন কখনও?'

'ছোটবেলায় আমাদের গ্রামেই খেয়েছি।'

তাঁর জীবনের প্রথম দিককার 'সকালবেলার আলো', 'সুপুরিবনের সারি' কবে কত দূরে ফেলে এসেছেন, তাঁর কোনও স্মৃতিই তাঁর মন থেকে মোছেনি।

শঙ্খ ঘোষ বলতে আমার মনে আসে তাঁর এই জীবনজোড়া স্মৃতি। তাঁর

প্রতিদিনের পথচলার প্রবল অভিঘাত। তাঁর বাল্যের, কৈশোরের, যৌবনের, সখ্যের, স্নেহের, শ্রদ্ধার, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা প্রতিবেশের বিস্ময়কর স্মৃতি।

তরুণ কবি, ছাত্র, বা অনুজ বন্ধু— সকলের প্রতি তাঁর নির্বিচার স্নেহ প্রীতি শুভকামনা, অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধা, সকলের প্রতি ভালোবাসা, শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো তাঁর সহজ নির্ভীকতা, নিঃস্বার্থ বিচার-বিবেচনা, তাঁর বদ্ধমূল সরলতা, স্বভাবজোড়া স্নিগ্ধতা— এই সবই মানুষটিকে আমাদের হৃদয়ের আসনে বসিয়েছে।

পঞ্চাশ বছরের অধিককাল তাঁর সান্নিধ্যধন্য আমি যখন যেটুকু তাঁকে দেখাবার সুযোগ পেয়েছি, তার সবটাই কি বুঝেছি? মনে হয় না। তবে এটুকু তো ঠিকই বুঝেছি যে, শঙ্খ ঘোষ স্বল্পবাক। যত শোনেন, বলেন না তার শতাংশও। মনে আছে, বামফ্রন্ট আমলে তাঁর নাট্য একাদেমির চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ করে আসার দিন বা হয়তো তার দুয়েকদিন পর বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু গিয়েছিলেন তাঁর বাড়ি, বোধহয় তাঁকে বোঝাতে। দূরদর্শনের সংবাদের নীচে ক্রমান্বয়ে স্ক্রোল দেখছি, বিমান বসু শঙ্খ ঘোষের বাড়ি গেলেন, বিমান বসু শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে কথা বলছেন। এরকম দুই-তিন পর্বের সংবাদে স্ক্রোল বোধহয় শেষ হল বেশি রাতের সংবাদের সঙ্গে।

কৌতূহলে অস্থির আমি সেই মুহূর্তে শঙ্খ ঘোষকে ফোন করি: 'বিমানবাবুর সঙ্গে এত দীর্ঘক্ষণ কী বিষয়ে কথা হল আপনার?'

তৎক্ষণাৎ তাঁর নির্বিকার উত্তর: 'আমি তো বলিনি কিছু। উনি বললেন, আমি শুনলাম।'

শঙ্খ ঘোষ শুধু কম বলেন না, অন্তরের সত্য ছাড়া বলেনই না। এতটাই যে অনেক সময় তাঁকে লাজুক বলে ভ্রম হয়। তাঁর কথায় যেমন, তাঁর লেখায়ও তেমনই। কোনও মেঘ গর্জন নেই। যা আছে তা মেঘ ভেঙে ফেটে পড়া আলো।

অথচ শঙ্খ ঘোষ একেবারেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনকাঠামোর সঙ্গে একটুও বেমানান নন, কোথাও ছাপিয়ে নেই, কোথাও জাহির নেই, কোথাও বাড়তি কোনও জ্যোতি নেই— অথচ একক অসামান্যতায় নিত্য-নির্মীয়মাণ।

শঙ্খ ঘোষ ভাবলেই আমার মনে আসে তাঁর মনভরা ভালোবাসা। তাঁর মায়া ও মমতা। দেশকালের সঙ্গে তাঁর এই মায়া-মমতা-ভালোবাসার সংঘর্ষ থেকেই তাঁর মন পেয়ে যায় তাঁর কবিতার মুহূর্ত, তাঁর শব্দ ছন্দ চিত্রকল্প।

শঙ্খ ঘোষকে আমার মনে হয় সারারাত পৃথিবী ভাসানো বৃষ্টির পরে সকালবেলার একটা গাছ, জোরে হাওয়া দিলে যে গাছ থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তাঁর জীবনটাই হয়তো এরকম অসংখ্য বৃষ্টির রাত, জোর হাওয়া দিলেই ঝর ঝর করে জল পড়বে। সে-ই তাঁর কথা, তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতার ধারাবাহিকতা যতই শেষ পর্বের দিকে এগোতে থাকে ততই এটা আরও বেশি ফুটে ওঠে।

(সাক্ষাৎকারে বলা ও ফেসবুকে লেখা দুয়েকটি অংশ এই লেখায় ব্যবহৃত)

'কালের কষ্টিপাথর', গ্রীষ্ম সংকলন ১৪২৬